লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি চাই না

সংবাদ : মোহাম্মদ শাহজাহান

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ১৫ অক্টোবর ২০১৯

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বুয়েটের ছাত্রলীগের নেতারা ঠাণ্ডা মাথায় এই পৈশাচিক ও নির্মম হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছেন। এ বর্বরতা ও নির্মমতার নিন্দা করার কোন ভাষা আমার জানা নেই। যারা নিরপরাধ সহপাঠীকে ঠাণ্ডা মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিটিয়ে হত্যা করতে পারে, তাদের আর যা-ই বলা যাক, মানুষ বলা যায় না। এরা মানুষ নামের অযোগ্য।

ছুটি শেষে কুষ্টিয়ার গ্রামের বাড়ি থেকে ৬ অক্টোবর রোববার বিকেলে নিজের ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ। ওই দিন বিকেলে শেরে বাংলা হলে নিজের ১০১১ নম্বর কক্ষে পৌঁছে ফোনে মায়ের সঙ্গে তিনি কথাও বলেন। খুবই মেধাবী আবরার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজেও ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ইচ্ছে ছিল প্রকৌশলী হবেন। মেডিকেলে কিছুদিন ক্লাস করার পর বুয়েটে ভর্তি হন। হত্যার পর ক্যাম্পাসের আলোচনায় বলা হয়, বাংলাদেশ

ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক কিছু চুক্তির সমালোচনা করে ফেসবুকে আবরারের কিছু স্ট্যাটাস এ হত্যার কারণ। তার সর্বশেষ স্ট্যাটাস ছিল ৫ অক্টোবর শনিবার বিকেল ৫টা ৩২ মিনিটে। এতে ভারতকে মোংলা বন্দর ব্যবহার ও গ্যাস রফতানির সমালোচনা ছিল। পরদিন রোববার সন্ধ্যারাতে নিজ কক্ষে লেখাপড়া করার সময় ফাহাদকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, শুরুতে ক্রিকেটের স্ট্যাম্প আর প্লাস্টিকের মোটা দড়ি (স্কিপিং রোপ) দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। একপর্যায়ে আহত ফাহাদ মাটিতে শুয়ে পড়েন। তাকে মাটি থেকে তুলে নরাধমরা আবারও পেটাতে থাকে। ঘণ্টা খানেক পেটানোর পর বমি করতে শুরু করেন। এভাবে তিনবার বমি করার পর নিস্তেজ হয়ে যান ফাহাদ। অন্যতম ঘাতক ইফতি মোশাররফ ওরফে সবার কক্ষেই অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে ফাহাদকে হত্যা করা হয়। আদালতে দেয়া ইফতির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির কিছু অংশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত আটকদের মধ্যে ইফতিই প্রথম আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। ফাহাদকে তার কক্ষ থেকে ইফতিই নির্যাতন কক্ষে ডেকে আনেন। জিজ্ঞাসাবাদে ইফতি বলেছেন, ৪ অক্টোবর বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান ওরফে রবিন শেরে বাংলা হল ছাত্রলীগের একটি মেসেঞ্জার গ্রুপে একটি নির্দেশনা দেন। এতে

বলা হয়, ‘আবরার শিবির করে, তাকে ধরতে হবে।’ এরপর মেসেঞ্জার গ্রুপে সাড়া দেন বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের আইনবিষয়ক উপ-সম্পাদক অমিত সাহা। আবরার তখন বাড়িতে থাকায় মেহেদী হাসান ইফতিকে বলেন, ‘ওকে বাড়ি থেকে ফিরতে দেন।’ আদালতে ইফতি বলেন, ৬ অক্টোবর রাত ৮টার কিছু পর আবরারকে ২০১১ নম্বর কক্ষে ডেকে নিয়ে আসা হয়। আবরারের দুটি মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপও সঙ্গে আনা হয়। তার রুমমেট বুয়েট ছাত্রলীগের উপ-দফতর সম্পাদক মুজতবা রাফিদ একটি মোবাইল ফোন এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের খন্দকার তাবাখখারুল ইসলাম ওরফে তানভীর আরেকটি মোবাইল ফোন চেক করেন। একই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের মুনতাসির আল জেমি আবরারের কাছ থেকে তার ল্যাপটপের পাসওয়ার্ড নিয়ে খুলে চেক করেন। ইফতি জবানবন্দিতে জানান, আবরারের ডিভাইসগুলো তারা যখন চেক করছিলেন, তখন মেহেদী হাসান এবং বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক মো. মেফতাহুল ইসলাম ওরফে জিয়ন (নেভাল আর্কিটেকচার মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র) ওই কক্ষে আসেন। বুয়েটে কারা কারা শিবির করে তা আবরারের কাছ থেকে বের করার জন্য মেহেদী তাদের নির্দেশ দেন। এ সময় আবরারকে মেহেদী বেশ কয়েকটি চর মারেন। ওই কক্ষে তখনো ক্রিকেটের কোনো স্ট্যাম্প ছিল না বলে ইফতি আদালতকে জানান। বাইরে থেকে তখন কেউ

একজন স্ট্যাম্প নিয়ে আসেন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শামসুল আরেফিন ওরফে রাফাত স্ট্যাম্প এনে তার হাতে দেন। ফাহাদের কাছ থেকে কথা বের করার জন্য ইফতি স্ট্যাম্প দিয়ে ৪/৫টি আঘাত করেন। এ সময় স্ট্যাম্পটি ভেঙে যায়। বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক অনিক সরকার (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র) স্ট্যাম্প দিয়ে আবরারের হাঁটু, পা, পায়ের তালু ও বাহুতে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকেন। এতে আবরার উল্টাপাল্টা কিছু নাম বলতে শুরু করেন। তখন মেফতাহুল আবরারকে চর মারেন এবং স্ট্যাম্প দিয়ে হাঁটুতে বাড়ি দেন। এ সময় মেহেদী মুঠোফোনে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাসেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

নিরাপরাধ সহপাঠীকে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন ইফতি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে পাষ-ইফতি ক্যান্টিনে খেতে যান। ১০ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে দেখেন বিধ্বস্ত, ক্লান্ত, আহত আবরার অসুস্থ অবস্থায় মেঝেতে শুয়ে রয়েছেন। ইফতির ধমকে আবার দাঁড়াতে বাধ্য হন আবরার। ওই অবস্থায় ইফতি আরও কয়েকটি চর মারেন। এরপর ইফতি, মুজাহিদুর রহমান ও তাবাখখারুল তিনজন একযোগে মারধর করেন। রাত ১১টার দিকে অনিক সরকার এসে স্ট্যাম্প দিয়ে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে এলোপাতাড়ি শতাধিক আঘাত করেন। বিভিন্নমুখী মারে আবরার একপর্যায়ে

চরমভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ সময় তিনি কয়েকবার বমি করেন। তখনো পাষণ্ডরা আবরারকে ডাক্তার দেখানোর চিন্তা-ভাবনা করেননি। ঘাতকদের একজন বলেন- ‘সে নাটক করছেন।’

আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনায় প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য বের হয়ে আসছে। শিবির সন্দেহে যখন অমানুষিকভাবে পেটানো হচ্ছিল, তখন তিনি বারবার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। এক পর্যায়ে সহপাঠী ঘাতকদের লক্ষ্য করে ফাহাদ বলেন, ‘আমি তো কোন অন্যায় করিনি, তবু তোমরা আমাকে মারছ কেন?’ পেটানোর সময় আবরার বারবার শিবির সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করছিলেন। এ সময় হামলাকারী সন্ত্রাসীরা বলতে থাকেন ‘শিবির না হলে তোর ফেসবুকে এ ধরনের স্ট্যাটাস কেন?’ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ফ্লোরে বেশ কয়েকবার শুয়ে পড়েন আবরার। তখন শোয়া থেকে তুলে আবার নির্যাতন করা হয়। কেউ কেউ মুখ ভেংচি দিয়ে বলছিল- ‘ও ঢং ধরেছে। ওষুধ পড়লে ঠিক হয়ে যাবে।’ ১১ অক্টোবর মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন নামে আরেকজন পাষণ্ড ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। এসব মনুষ্যরূপী জানোয়াররা তাদের নিরপরাধ একজন সহপাঠীকে যেভাবে স্ট্যাম্প দিয়ে পিটিয়েছে, চর, থাপ্পর, কিল-ঘুষি দিয়েছে, আধমরা অবস্থায়ও আঘাতের পর আঘাত করেছে, একটি হিংস্র কুকুরও আরেকটি কুকুরের ওপর এভাবে হামলে পড়ে না।

আবরার হত্যায় সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে নির্দয় পাষণ্ড ছিল অনিক সরকার। ১২ অক্টোবর আদালতে দেয়া জবানবন্দিতে অনিক বলেন, ‘ওকে আগে থেকেই শিবির বলে সন্দেহ করা হতো। যখন ওর কক্ষ থেকে ধরে আনা হয় তখন সে আবোল-তাবোল কথা বলছিল। ওর মোবাইলে ইসলামী গান ও গজল পাওয়া যায়। যখন ও শিবিরে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে এলোমেলো কথা বলছিল, তখনই স্ট্যাম্প দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকি। দুই দফায় মেরেছি। একবার টানা এক ঘণ্টা পিটিয়েছি।’ তদন্তে উঠে এসেছে। ঘটনার সময় অনিক মদ্যপ ছিলেন। আবরারকে মারধরের সময় অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করেছেন সে। এমন নির্মমতার পরেও এই পাষণ্ড অনুতপ্ত নন। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে অনিক জানান, ‘প্রথমে চর-থাপ্পড় মারেন মেহেদি। এরপর আমি কিল-ঘুষি দেই। ইফতিও চর-থাপ্পর মারতে থাকেন। একপর্যায়ে সামসুল আরেফিন ক্রিকেট স্ট্যাম্প নিয়ে আসেন। আমি স্ট্যাম্প দিয়ে ফাহাদের গায়ে পেটাতে থাকি। ওর দু হাত টানটান করে স্ট্যাম্প দিয়ে পেটাতে থাকি। ফাহাদ তখন চিৎকার করে কাঁদতেও পারেনি। অন্যরা ওর মুখ চেপে ধরে রেখেছিল। এভাবে থেমে থেমে ইফতি, জিয়ন ও আমি পেটাতে থাকি ফাহাদকে।’

আবরারকে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ইফতি, জিয়ন ও অনিক ক্যান্টিনে খেতে যান। ওরা খেয়ে এসে দেখেন দুর্বল ফাহাদ

মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। ওই সময় বমি করেন ফাহাদ। পাষণ্ড অনিক ভাবে সে ভান করছেন। এরপর ওই দুর্বল নিস্তেজ শরীরে নরাধম অনিক আবারও পেটাতে শুরু করেন। মেঝেতে উপুর হয়ে থাকা আবরারকে ওই নিস্তেজ শরীরে অনিক প্রায় আধঘণ্টা পেটান। একপর্যায়ে পুরোপুরি নিস্তেজ হয়ে পড়েন ফাহাদ। শেষবার নিস্তেজ হওয়ার আগে আবরার আবারও বমি করেন। তখন আবরারের কক্ষ থেকে ওর কাপড়-চোপড় নিয়ে আসেন একজন। পুলিশের হাতে দেয়ার জন্য আবরারকে নিচে নামাতে বলেন মেহেদী। অনিক, জেমি, মৌয়াজ ও শামীমসহ ৩/৪ জন নিস্তেজ আবরারকে ধরাধরি করে সিঁড়িঘরের পাশে নিয়ে যায়। আরও পরে পুলিশ এবং চিকিৎসকদের খবর দেওয়া হয়। চিকিৎসক এসে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা যখন আবরারকে মারধর করছিল তখন খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল। কিন্তু পুলিশ হলের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পুলিশকে ঢুকতে না দিয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে বসিয়ে রাখে। এ সময় আবরারকে উদ্ধারে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে এক ঘণ্টা হলগেটে বসে থেকে পুলিশ চলে যায়। দ্বিতীয়বার যখন পুলিশ আসে, তখন আবরার আর বেঁচে নেই। চকবাজার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল রাত দেড়টার দিকে হলগেটে গিয়েছিল। দেলোয়ার হোসেন বলেছেন,

ছাত্রলীগের নেতা তাদের ঢুকতে দেয়নি। তাছাড়া 'অনুমতি ছাড়া হলের ভেতরে গেলে অন্য কিছু হতে পারে ভেবে তারা ভেতরে যাননি।' কি হতো পুলিশ যদি ছাত্রলীগের ওই নেতার হুকুম না মানতো? ওই সময় পুলিশ টর্চার রুমে গেলে একটি জীবনতো বেঁচে যেত। পুলিশ তো ওই সময় সুবোধ বালকের মতো বসে না থেকে তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাতে পারত। সেটাও তারা করেনি। এভাবে সাক্ষী গোপালের মতো বসে থেকে একজন সম্ভাবনাময় ছাত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে পুলিশ। অথচ যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশের প্রধান কাজ হলো 'ঘটনার শিকার ব্যক্তিকে উদ্ধার করা। কেউ যখন মৃত্যুঝুঁকিতে থাকেন, শারীরিক ক্ষতির শিকার হওয়ার আশঙ্কায় থাকেন, তখন তাকে উদ্ধার করাই প্রধান কাজ।' কি পরিস্থিতিতে পুলিশ সেদিন হলগেট থেকে ফিরে গিয়েছিল, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা তদন্ত করে দেখবে বলে আশা করি।

আমাদের বুঝতে হবে, বুয়েটের ছেলেরা হঠাৎ করে দানবে পরিণত হয়নি। সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম-বেশি এমন ঘটনা ঘটছে। আমরা অনেক কিছু জেনেও না জানার ভান করছি। এভাবে ধীরে ধীরে আমরা এক অনিশ্চিত অনিরাপদ পরিস্থিতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি, যা কারও জন্যই সুখকর নয়। বুয়েটের শেরে বাংলা হলের ২০১১ নম্বর কক্ষটি যে টর্চার সেলে পরিণত হয়েছে, তা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রাধ্যক্ষরা জানতেন না? নিশ্চিতভাবেই তারা তা

জানতেন। এ ঘটনার পর এখন তো অনেক কিছুই বের হয়ে আসছে। ফাহাদ হত্যার পর অনেক শিক্ষার্থী সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেছেন, তারা মার খেয়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত, প্রহৃত হয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন। কোন প্রতিকার পাননি। অনেক শিক্ষক ক্ষমতাসীনদের অনুগত। এমনকি দলকানা। এমনও কেউ কেউ আছেন, যারা পদ-পদবির লোভে সন্ত্রাসী ছাত্রনেতাদের তোষণ করেন। ১২ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিকে প্রথম পাতায় বিশ্ববিদ্যালয় হলে ‘টর্চার সেল কালচার’ শিরোনামে একটি রিপোর্টে লিখেছে- দেশের অনন্ত ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক এমন ‘টর্চার সেল’ রয়েছে। যেখানে যখন-তখন ভিন্নমত পোষণকারীদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। ৫ বছরে নির্যাতিত হয়ে ৩০ শিক্ষার্থী বুয়েট ছেড়ে চলে গেছেন। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। অত্যাচারিত ও নির্যাতত হয়েও অনেকে মুখ খুলতে সাহস পায় না। এসব টর্চার সেলের কোন কোনটিতে ইলেকট্রিক শক দেয়ার মতো ভয়ঙ্কর নির্যাতন সামগ্রীও নাকি রয়েছে। এছাড়া লাঠি, হকিস্টিক, ক্রিকেট স্ট্যাম্প, লোহার রড দ্বারা অত্যাচার নির্যাতন করা হয়। বর্তমানের ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য হিটলারের নাৎসী যুগের ‘গেস্টাপো বাহিনী’র কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে চলছে পেশিশক্তির প্রতিযোগিতা। পেশির দাপট না থাকলে ছাত্রনেতাদের দাপট, কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব থাকে না। ভর্তি-বাণিজ্য ও সিট বণ্টন করতে না পারলে মোটা অঙ্কের টাকা

মেলে না। কাজেই পেশীশক্তির দানবীয় দাপটই বর্তমানে নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা।

অবশেষে আন্দোলনের মুখে ১১ অক্টোবর বুয়েটের উপাচার্য শিক্ষার্থীদের ১০ দফা দাবি মেনে নিয়েছেন। আবরার হত্যার পর অভিভাবক হিসেবে উপাচার্যের ভূমিকা নিয়ে যে কথা উঠেছে, সে জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। তবে আবরার হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানান উপাচার্য। আসলে ছাত্র রাজনীতি নয়, ছাত্র রাজনীতির নামে যে ধ্বংসাত্মক ও রক্তাক্ত কর্মকাণ্ড চলছে, তা মানুষ আর মেনে নিতে পারছে না। বুয়েটসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টর্চার সেলে নির্যাতন, র‌্যাগিং ও নানা অত্যাচার নির্যাতন বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। এতদিন এ ব্যাপারে কেউ টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করার সাহাস পায়নি। এখন সব প্রতিষ্ঠান থেকে এর মূল্যোৎপাটন করতে হবে।

গত ১১ বছর ধরে দেশে টানা আওয়ামী লীগের একচেটিয়া শাসন চলছে। বিরোধী দল আছে কি নেই সেটা এখন আর বোঝা যায় না। আমি খুব আশাবাদী মানুষ। কিন্তু সর্বপর্যায়ে যে অনাচার, অনিয়ম, অনৈতিকতা, বাড়াবাড়ি চলছে, তা নিয়ন্ত্রণে আনা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না। কেউ কেউ ভাবেন, বিরোধী দলের আন্দোলন করার ক্ষমতা নেই। সাংগঠনিকভাবেও ওরা দুর্বল। কাজেই আবারও নির্বাচনে আমরাই ক্ষমতায় আসব। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, আম পেকে গেলে, বাতাস লাগে না।

এমনিতেই পড়ে যায়। অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ হয় না। আবারও বলছি, ছাত্র রাজনীতি নয়, ছাত্র রাজনীতির নামে যে অনাচার, অবিচার, অত্যাচার, সন্ত্রাস ও গুণ্ডামি চলছে, তা বন্ধ করতে হবে। সবশেষে ৮ অক্টোবর দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধের কিছু অংশ দিয়েই এ লেখার ইতি টানতে চাই। সংবাদ লিখেছে : ‘ছাত্রলীগ নিয়েই আজ সর্বত্র আতঙ্ক। ... ছাত্রলীগের এ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ না হলে ছাত্র রাজনীতি তো বটেই, গোটা সমাজ এবং জাতীয় রাজনীতিকেও চরম মূল্য দিতে হবে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে বুঝতে হবে, পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, দুর্নীতি ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি ছাত্রলীগকে বেপরোয়া করে তুলছে। ভবিষ্যতে তাদের দ্বারা বড় বিপর্যয় ঘটার আগেই সরকারের উচিত রাশ টেনে ধরা। এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে, এখনই এর লাগাম টেনে না ধরলে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার করতে হবে। দলীয় পরিচয়ে যেন কেউ ছাড় না পায়।’ অতএব, এখনই ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরুন। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে।

১৩ অক্টোবর ২০১৯

[লেখক : সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা সম্পাদক]